উপন্যাস সঙ্কলন

প্রথম খণ্ড

নজমূল হক চৌধুরী

সম্পাদনা

মাসুদুর রহমান

ডেপুটি ডাইরেক্টর

গবেষণা বিভাগ

বাংলা একাডেমি

ঢাকা।

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

নুরুল ইসলাম খান, এম, এ,
প্রতিষ্ঠাতা,
নাগমুদ বাজার উচ্চবিদ্যালয়,
উপজেলা- রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

ভূমিকা

কবি নজমূল হক চৌধুরীর "উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ডতে" তাঁর পাঁচটি উপন্যাস সঙ্কলিত হল। যথা— এক জোড়া নীল চোখ, কেশের কাঁটা, বাসনার উপবন, আংটি বদল, সর্ষে হলুদ বরণ বৌ। নজমূল-গীতি : প্রথম খণ্ড, নজমূল কাব্য : অখণ্ড-এর পর তাঁর গদ্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ একটি জগত "উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড" প্রকাশের সুব্যবস্থা হল। এ মহৎ কাজের জন্য সম্প্রীতি প্রকাশের মালিক রেজাউল করিম বিল্লাল সাহেবকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলিও পড়েছি এবং একটি অন্তর্নিহিত রহস্য লক্ষ্য করেছি। তা হল, নজরুলের সকল উপন্যাসে নায়ক দুইজন ও নায়িকা একজন! এতে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং চরিত্র পরিষ্কৃত হয়ে শুদ্ধ মনস্তত্ত্বিকতায় বিশ্লেষিত হয়েছে। নজমূল এক্ষেত্রে নজরুলের বিপরীতধর্মী। নজমূলের উপন্যাসে নায়ক একজন কিন্তু নায়িকা দুইজন। অর্থাৎ নজরুলীয় উপন্যাসগুলিতে পৌরুষের আবেদন এবং নজমূলীয় উপন্যাসগুলিতে নারীত্ব আবেদন সৃষ্টি করেছে। এক জোড়া নীল চোখে নায়ক রাহুল এবং নায়িকা এলিনা ও পাপিয়া; কেশের কাঁটায় নায়ক জিলান এবং নায়িকা পারিয়া ও পোর্শিয়া এবং বাসনার উপবনে নায়ক দারুল এবং নায়িকা বাসনা ও শায়লা ইত্যাদি। এরূপ কৌশল গ্রহণ করায় কখনো সংঘাত, বা কখনো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমস্যা-রহস্যগুলিকে উন্মুক্ত করতঃ উপজীব্য-জাতবোধানুযায়ী পরিষ্কৃত হয়েছে।

নজমূলের উপন্যাসগুলি পড়লে বুঝা যায় যে বাংলা ভাষার অর্থ-প্রকাশের শক্তি কত বিস্ময়কর, অর্থ কত বিভিন্নমুখী এবং প্রয়োগবিধি কত ব্যঞ্জনাময়! বড় কথা, নজমূলের মতে চিরন্তন বা স্থায়ী চরিত্র বলতে কিছুই নেই। মানুষ তার সত্তাকে বিভিন্ন কর্ম, মনোভাব, আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সত্তা প্রকাশক এই উপাদানগুলি স্থায়ী কোন সঞ্চয় নয়। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং চরিত্র বলতে কিছু নেই। মানুষ তার সত্তাকে যেসব বিভিন্ন নিয়ামকের সাহায্যে প্রকাশ করে তাকে "আচরণ" বলাই উত্তম। ইংরেজিতে এটাকে behaviourism বলে। তাই নজমূলীয় উপন্যাসগুলিতে চরিত্র নয়, আচরণবাদই বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিমূর্তি লাভ করেছে। বলা যায় Nazmul artfully painted the main and central roles in his novels not to discuss the characters but to bring out behaviourisml the visualisation of human essence. The central themes of his novels are not character but behaviourism, that is the cardinal feeling of humanism, is

generally expressed by Nazmul through emotion, idea, deed and need. আমার মতে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি গোটা বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস জগতে নতুন।

নজমূলের উপন্যাসগুলিতে নারীচরিত্রের ভূমিকা প্রধান হওয়ায় তাঁকে নারীঘেষা মনে হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবার্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তিনি নারীত্ব, বিধায়িনীত্ব এবং সর্বোপরি মাতৃত্বকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। নজমূল মূলতঃ কবি এবং তাঁর আদর্শবাদী কবিমানস বৈচিত্র্যময়। তিনি কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস– সর্বত্রই যেমন অতিপ্রাকৃতের স্বপ্নদ্রষ্টা, তেমনি রোম্যান্টিক ভাব-কল্পনামুখর চিন্তাশীল। তাঁর উপন্যাসে কাব্যের ঝঙ্কারও এই অতিপ্রাকৃত ও রোম্যান্টিক ভাব-কল্পনারই অন্যদিক। তাঁর অতিপ্রাকৃত ধারণা জীবনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন, সংঘাত ও অন্যদিকে আদর্শবাদকে আশ্রয় করে ধর্ম ও কর্ম-মহিমার পাঠদান তৈরি করেছে। নজমূল কর্মবাদে বিশ্বাসী। ধর্ম-কর্মকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম, কর্ম ও প্রেমের জটিল বিশ্লেষণ তাঁর "সর্ষে হলুদ বরণ বৌ"। এ উপন্যাসে হিসাব উদ্দিনের চরিত্র দ্বারা কর্মবাদ, বিলকিছের চরিত্র দ্বারা ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতবাদ এবং কান্তা ও কুদরতের চরিত্র দ্বারা মাতৃত্ব ও পৌরুষকে চিত্রিত করা হয়েছে। পরিণামে নারীত্ব ও পৌরুষ দুই-ই কলঙ্কিত হলেও সংসার-জীবনের স্বরূপ, বন্দীদশা, মুক্তি ও দায়বদ্ধতাকে বেগবান গতিতে প্রবাহিত করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নজমূলের প্রতিটি উপন্যাস এক একটি দীর্ঘাকৃতির ছোটগল্পের মত। নারীত্ব ও পৌরুষ এই দুই ভাবধারার মিশ্রণের ফলে এক আদর্শমালা, রোম্যান্টিক বর্ণবহুল কতকগুলি চিত্রণের মাধ্যমে অল্প শিক্ষিত বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে আশ্রয় করে সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসগুলি সাহিত্য বটে।

উপন্যাসে নজমূল-সৃষ্ট রোম্যান্স বাহ্য-বৈচিত্র্য ও আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত সংঘটন-নির্ভর নয়। এই রোম্যান্স একান্তই অন্তর্মূখী, মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনধর্মী এবং ভাবলোকে মন্থন করার মত। তাঁর উপন্যাসে কাহিনীসংক্রান্ত বর্ণনার চেয়ে প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, উদ্বেলতা, বিক্ষোভ, আনন্দই রোম্যান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে অবলীলাক্রমে।

আমি আগেই বলেছি, নজমূলের উপন্যাসে স্বাপ্নিকতা অনুপস্থিত, বাস্তবনিষ্ঠতাই প্রধান্য লাভ করেছে। এগুলি সূক্ষ ও বিস্তৃত কার্যকারণ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বাস্তবানুভূতি দৃঢ় ও প্রবলরূপে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে জীবনের গতি বেগবান, দীর্ঘায়িত না হলেও তত্ত্ববহুল, ঘটনাবহুল এবং সমস্যাবহুল। তাঁর লেখার বাস্তবনিষ্ঠতা মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্নমুখী বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলিকে অনায়াসে টেনে বের করেছে। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সম্পর্কে চেতনাইতো সামাজিক চেতনা।

"কেশের কাঁটা" উপন্যাসটি মূলতঃ প্রেমাত্মক হলেও যে নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিশাল বিশ্বকে মায়া-স্নেহ-মমতা দ্বারা প্রতিপালন করছে তার অসহায়ত্ব, কুটিলতা এবং সর্বনাশী শক্তিসম্পর্কেও আমরা অবহিত হই। পারিয়ার মৃত্যু চক্রান্তধর্মী tragedy; কিন্তু "বাসনার উপবনে" বাসনার মৃত্যু নাটকীয় tragedy. আমার মতে, নাটকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আধিক্য হেতু নজমূলের উপন্যাসগুলি এত বাস্তবনিষ্ঠ হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলি করুণরসাত্মক হওয়ায় পঠনাগ্রহ প্রবলতর হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর যে কোন উপন্যাস যে কোন পাঠক পড়তে নিলে একাধারে পড়ে শেষ করতে হয়। একাধারে পড়ে শেষ করার একটি প্রবল ও অদম্য আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ভেঙে পড়তে গেলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কারণ, তাঁর উপন্যাসে গল্পের আঙ্গিকের চেয়ে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বেশী। তবে এটা সত্য, চরিত্রগুলির পরিণাম কল্পলোকের ভাবাদর্শের জগতে বিসর্জিত হয়নি, যার যার অনিবার্য পরিণাম সংঘটিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, নজমূল কর্মতত্ত্ব-মতবাদপন্থী; অদৃষ্টবাদী নন। বলা যায় ঃ Every character results into according to deeds and misdeeds, but creating a blameless impression on the mind about the idea, imagination and sentiment of the movelist. The roles speak themselves about their goodnees or badness, being self born but not created, bearing the sameness with deeds and results. নজমূলের উপন্যাসে অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত এবং বিরক্তিকর কোন চরিত্র স্থান পায়নি; চরিত্র-সংখ্যা প্রয়োজনীয় এবং একান্তই পরিমিত। ঘটনা বর্ণনায় কোথাও বলার বাহুল্যতার সৃষ্টি হয়নি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অখণ্ড নয়, খণ্ডকালীন জীবনের এবং শিল্পের বাস্তবতায় সৃষ্ট।

যে মধ্যবিত্ত সমাজ নজমূলের উপন্যাসের উপজীব্য, সেই সমাজের অঙ্কিত ছবি বিশ্বাসযোগ্য, অতি রঞ্জিত নয়, তথ্যসমৃদ্ধ নয়, জীবনের প্রবাহ একান্তই স্বাভাবিক। তাঁর উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির সাথে এবং ঘটনা বর্ণনার সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলি কতটুকু সার্থক হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, বস্তুনিরপেক্ষ হয়েছে, সে বিচার সুদূর প্রসারী, কিন্তু পাঠকের মনে কোথাও বাস্তবতার অনুভূতি ক্ষুণ্নতার সৃষ্টি করে না। এর মূল কারণ, তিনি জীবনের প্রাত্যহিক সুখ, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, সমস্যা, গ্লানি, গৌরব, বিরোধ, কলহ, আনন্দ, ঘাত, প্রতিঘাত সবকিছুই পরিপূর্ণ করে, বিস্তৃত করে, কার্যকারণ ও পরম্পরা বিশ্লেষণ করে বাস্তবতার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস একটি একক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কতকগুলি খণ্ডকাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ The chapters of the same and single novel are consisted of some separate episodes, not joint in structure, but attached to the short-storylike episodes with the dress of accomplishments which have made the singleness of the plot easily, but making it intact indeed.

নজমূলের প্রতিটি উপন্যাসে নায়ক ও নায়িকাদের মনে প্রথমতঃ উদগ্র যৌন কামনার ফলস্বরূপে প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পরিণামে দেখা যায়, এ যৌন-কামনা শেষটায় নারী-পুরুষের মধ্যে বিধাতাকৃত বন্ধন সৃষ্টির কৌশলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পারিয়ার মৃত্যু, পোর্শিয়ার জীবনাবসানের প্রস্তুতি অথবা বাসনার আকস্মিক মৃত্যু মানসকে অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকে টেনে নিয়ে যায়। দেহতত্ত্ব হারিয়ে গিয়ে আধ্যাত্মবাদ বা অতিপ্রাকৃত ধারণার সৃষ্টি হয়। মানস যেন দেহ থেকে দেহাতীতে বিচরণ করে। পারিয়া ও বাসনার আকস্মিক মৃত্যু বিমূঢ়তা সৃষ্টি করে; কিন্তু এ মৃত্যু এমনি ভাবের জন্ম দেয় যে, মৃত্যু বিস্ময়কর নয়, বরং বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর। বড় কথা, নজমূলের উপন্যাসগুলি যুগোপযোগী হওয়া সত্ত্বেও যুগান্তরের আবেদন উৎপাদনধর্মী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। Nazmul's novels are congenial to his age, but possess epoch-making analystic appeal for their refine taste, sentiment, manufacture and literary value. ধন্যবাদান্তে–

মাসুদুর রহমান
ডেপুটি ডাইরেক্টর
গবেষণা বিভাগ
বাংলা একাডেমি
ঢাকা

সূচিক্রম

একজোড়া নীল চোখ ◆ ১৩
কেশের কাঁটা ◆ ৮৩
বাসনার উপবন ◆ ১৪৬
আংটি বদল ◆ ১৯৮
সর্ষে হলুদ বরণ বউ ◆ ২৪৪

একজোড়া নীল চোখ

এক

পাপিয়া। নামটি ভারি মিষ্টি। একটি স্মার্ট, সুশ্রী, শিক্ষিতা তরুণী, কথা-বার্তায় বেশ সাবলীল। চলার গতি, তনুর চমক এবং চোখের হরিণী চাউনী– সবকিছুই ছান্দিক, যে কোন তরুণের নিরামিষ জীবনে প্রেম-পিয়াসের শিহরণ সৃষ্টি করবার মত।

রাহুল একজন মোটামুটি হ্যান্ডছাম তরুণ। বয়স আটাশ। আচার-আচরণে অত্যন্ত ইম্প্রেসিভ। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট। বাংলাদেশে আজকাল সহজে চাকুরি মেলে না। তাই তিনি বর্তমানে ফকিরাপুল ও আরামবাগে টিউশনী করে ম্যাছে থেকে হতাশাগ্রস্ত জীবন কাটাচ্ছেন।

বাবা-মা মারা যাবার পর তাঁর বড় ভাই নজরুল হক সংসার থেকে পৃথক হয়ে পড়লেন স্ত্রীর শলা-পরামর্শ অনুযায়ী। তিনি আর রাহুলের পড়া-শুনার খরচ চালাতে পারবেন না বলে আই, এসসি, পাস করার পর রাহুল বাড়ি ছেড়ে ভাগ্যের অন্বেষণে চলে এলেন ঢাকায়। তারপর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে গেল সিলেটে। সেখানে তিনি একদিকে জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৌলভী সাহির আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং অন্যদিকে প্রাইভেটে পড়াশুনা করে বি. এ. পাস করলেন। এরপর আবার সৌভাগ্যের সন্ধানে চলে আসেন ঢাকায়। এখানে এসে দূরশিক্ষণে নিলেন বি. এড. ডিগ্রি। চাকুরির বাজার বেজায় প্রতিযোগীতামূলক, চিন্তা করে আবার পড়াশুনা করে ইংরেজিতে সার্টিফিকেট কোর্সে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলেন।

পাপিয়ার জন্মস্থান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানায়। তিনি তাঁর বড় বোনের কাছে ঢাকায় থাকেন। পাপিয়া গ্র্যাজুয়েট। ছয় কক্ষ-বিশিষ্ট একটি বাসার তিন কক্ষ ভাড়া নিয়েছেন পাপিয়ার বোন। বাকি তিন কক্ষে ভাড়া থাকেন পাবনার এক ভদ্রলোক। তাঁর তিনটি ছেলে- মেয়েকে বিকেলে পড়ান রাহুল।

রাহুল আজ প্রায় এক মাস যাবৎ পড়াচ্ছেন। বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতানো। রাহুল যখন পড়ান, পাপিয়া তখন নীরবে আড়াল হতে অনুধাবন করেন রাহুলের মেজাজ ও মন-মানসিকতা। তাঁর কাছে বেশ ভাললাগে রাহুলের টিচিং। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে পাপিয়া রাহুলের কাছে আসবেন। কথা বলবেন এবং পরিচিত হবেন। কিন্তু লজ্জায় এসব চিন্তা দ্রবীভূত হয় চোখের জোয়ারের পানিতে। কেউ যদি কিছু মনে করে, অশোভনীয় কিছু চিন্তা করে বসে।

রাহুল পড়াতে বসলে কখনও-কখনও পাপিয়া কারণে অকারণে বারান্দায় আসেন এলিয়ে দেওয়া কাপড় গুছাতে বা বারান্দাটা ঝাড়ু দিতে, নয়তো চেয়ারগুলি সাজিয়ে রাখতে।

পাপিয়ার এই গতিবিধি এখন রাহুলের অন্তরের বোর্ডে আঁকা চকের দাগের মত রেখাপাত করে চলছে। তা সত্বেও তিনি শিক্ষকতার গাম্ভীর্য নিয়ে পড়াতে থাকেন অটল-অবিচল ভঙ্গিতে। পাপিয়ার জানতে ইচ্ছে হল রাহুলের বাড়ি কোথায়, তাঁর ডিগ্রি কি এবং বর্তমানে তিনি কি করেন। চাকুরিও করেন, না কি শুধু টিউশনী করে জীবন-যাপন করেন।

ঘুমাতে গেলে, নির্জনে বসলে বা বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতার স্বপ্নে মগ্ন হলে শুধু রাহুলের সৌম্য ছবিটাই পাপিয়ার মনে ভেসে ওঠে। আর তিনি তো জীবনে বেশি কিছু চান না, শুধু এ রকম একজন কর্মযোগী পুরুষকেই চান। যাঁকে নিবিড়-নিভৃতে বুকে নিয়ে প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারবেন। তাঁর এ যাবৎ সংগৃহিত সমস্ত সঞ্চয় দিয়েও কি তিনি এমন একজন পুরুষ পাবার যোগ্য নন? একজন নারীর কাছে তো একজন কর্মযোগী প্রেমিক পুরুষই খোদার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান বস্তু। সবার অজান্তে পাপিয়া এসব চিন্তা করে যাচ্ছেন এবং রাহুলের সান্নিধ্য লাভের জন্যও সুযোগ প্রার্থনা করছেন আল্লাহ্‌র কাছে—একান্ত সঙ্গোপনে।

পাপিয়া সন্ধ্যাবেলা আরামবাগ গিয়েছেন তাঁর বড় ভাই-এর বাসায়। তিনি ফিরে আসার সময় দেখেন রাহুল মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে ম্যাছে ফিরছেন। কি যে ভাললাগল পাপিয়াার কাছে। ইচ্ছে হল নির্জনে রাহুলকে পেলে প্রাণ-খোলা হাঁসিতে খোশগল্প করতেন তাঁর সাথে। কিন্তু প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিতে সমাজে এত বাঁধা কেন? এ বিশাল মুক্ত পৃথিবীতে মানুষের মন–প্রাণ এত বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ! হেথায় মুক্ত মনের ইচ্ছা কেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

একদিন পাবনার ভদ্রলোক অফিস থেকে এসে এক দুঃসংবাদ শুনে পরিবারের সকলকে নিয়ে হঠাৎ রামপুরায় চলে গেছেন তাঁর ছোট ভাইএর বাসায়। রাহুল জানেন না। বিকেল পাঁচটায় পড়াতে এসে রাহুল দেখেন বাসা তালা-মারা। রাহুল ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ফিরে আসবেন, না অপেক্ষা করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অদূর থেকে পাপিয়া বললেন, "আপনি পড়াতে এসেছেন? এখানে এসে বসুন। তাঁরা হঠাৎ এক জরুরী সংবাদ পেয়ে রামপুরায় গেছেন। আসতে দেরী হবে। আজ মনে হয় আপনাকে পড়াতে হবে না। আসুন, এখানে এসে বসুন।" কণ্ঠে যেন তাঁর অনাদিকালের অনুনয়। এরূপ অনুনয় কোন পুরুষ অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

একটি চেয়ার পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও আঁচল দিয়ে মুছে রাহুলকে বসতে দিলেন পাপিয়া। রাহুল বসলেন। পাপিয়া বললেন, "তারা আপনাকে মাসিক কত টাকা বেতন দেন?"

"পাঁচ'শ টাকা।"

"আপনি কি চাকুরি করেন, না শুধু টিউশনী করেন? মোট কতটি টিউশনী আছে আপনার?"

রাহুল বললেন, "না, চাকুরি নেই। শুধু টিউশনী করি। মোট চারটি টিউশনী আছে।"

"ও আচ্ছা, চা খাবেন, এনে দিই?"

"না, কষ্ট করবেন না। আমি অভ্যাসগতভাবে চা খাই না।"

তথাপি পাপিয়া ভিতরে গেলেন রাহুলকে "বসুন" বলে। ফ্লাক্স থেকে এক কাপ চা পিরিচে কয়েকটি বিস্কুট এনে হাত মেলে বললেন রাহুলকে। কি আর করা! রাহুল একটি বিস্কুট এবং চা-কাপ ডান হাত বাড়িয়ে নিয়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

পাপিয়া অনুসন্ধানের সুরে বললেন, "আপনার ডিগ্রি কি?"

রাহুল অভিযোগের সুরে উত্তর দিলেন, "আর ডিগ্রি দিয়ে কি হবে, বলুন? আমার ডিগ্রি তো অকেজো। আমি বি. এ., সি. সি. ই., বি. এড.।"

পাপিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "সি. সি. ই ডিগ্রিটা কি?"

রাহুল বললেন। "সি. সি. ই. অর্থ সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইংলিশ।" রাহুল আরও বললেন, "চাকুরির জন্য খুব চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। জানি না ভাগ্যে কি আছে। আচ্ছা আসি, আপনাকে কষ্ট দিলাম।"

রাহুল স্বভাবগত গাম্ভীর্য নিয়ে ফিরে চলে এলেন ম্যাছে।

সেদিন থেকে পড়াতে এলে রাহুল ও পাপিয়ার চোখে চোখে কথা হয়, এমনি গতি-বিধিতে অব্যক্ত কিছু ভাব বিনিময় হয়। কিন্তু ঠুনকো জীবনের অনিশ্চয়তা আত্মার আকর্ষণকে প্রগাঢ় হতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা তাঁদের কারুর দোষ নয়। কারণ জীবনের আস্তিত্ব যেখানে অসহায় ও জরাজীর্ণ সেখানে আত্মিক বাসনার অভিযোগ অবদমিত, নিয়ন্ত্রিত ও বিবেকপ্রসূত।

ম্যাছে এসে রাহুলের ভাললাগল না। মতিঝিল রোডে পাকা ফুটপাত দিয়ে অলসভাবে হাঁটতে লাগলেন। কত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা অফিসের ব্যস্ততা সেরে বাসায় ফিরছেন। রাহুল ভাবতে লাগলেন—এঁরা কি সবাই সুখী এ পৃথিবীতে? শুধু কি তাঁর জীবনটাই এত বিষদ-মাখা। চাকুরি পেয়ে পাপিয়ার মত একটি সুশ্রী তরুণীকে বিয়ে করলে তাঁর মরুময় প্রাণে বেঁচে থাকার সুপ্ত বীজ জাগ্রত হত। পাপিয়ার মধুময় পরশ তাঁর প্রেমকুঞ্জে মুকুল ফোটাতে চায় কিন্তু আশার অনুকূলে দখিনা হাওয়া আজো যে জীবন-শাখায় বইছে না। ভাবতে ভাবতে রাহুলের চোখে অজান্তে অশ্রু নেমে আসে অঝোর ধারায়। রাহুল বিশাল জনতার ভিড়ে সঙ্গোপনে চোখ মুছে নেন।

বেলা ডুবছে দেখে ফিরে এসে ফকিরাপুল মসজিদে নামাজ পড়ে নীরবে কাঁদেন আল্লাহ্‌র দরবারে। দিন দিন বাংলাদেশের দরিদ্র সমাজের অবহেলা, বঞ্চনা ও বিকর্ষণে পড়ে রাহুল আল্লাহ্‌র কাছে আত্ম সমর্পণের প্রতি ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। তিনি আর মানুষের কাছে নয়, যিনি দ্বীন-দুনিয়ার মালিক তাঁরই দ্বারে আর্তনাদ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। এটা সত্য যে, সৃষ্টিকর্তার বিশ্ব-ব্যাপৃত আত্মার সাথে বান্দার আত্মার একীকরণ প্রক্রিয়াই আধ্যাত্মিকতা। আর এই প্রক্রিয়া চলাকালে যে কোন ব্যক্তি প্রশান্ত-সমাহিতের মত গম্ভীর হয়ে ওঠে। তিনি হয়ে ওঠেন নীরবে অন্তর্মুখী, জগতের চাক-চিক্যময় বাহ্যিকতা তাঁকে যেন শুধু উপহাসই করে। এরূপ অতি প্রাকৃত মনোযোগ ছাড়া কোন ভক্ত-বান্দাই সৃষ্টি কর্তাকে রাজি করাতে পারেন না। এ প্রক্রিয়া হল বিশাল ভোজন-শালায় উপস্থিত থেকে ও আমন্ত্রিত হয়ে উপবাস থাকা। এ অবস্থায় আমি জীবনকে নিরামিষ বলি।

রাহুলের জীবনে-বাস্তবে ঘটলও তাই। একদিন পড়াতে গিয়ে দেখেন পাপিয়া সে বাসায় নেই। তাঁরা শান্তিনগরে বাসা ভাড়া নিয়ে চলে গেছেন। পাপিয়া রাহুলের রক্তাক্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেননি। বিদায়-বেলা একটিবার নয়ন ভরে দেখে নেওয়ার সুযোগও দিলেন না।

পাপিয়াও লুকিয়ে কেঁদেছিলেন। আর ভেবেছিলেন,—তিনি তো বনের পাপিয়া পাখি। জীবনের হাওয়ার গতির পালা-বদলে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়ান। জীবন যেদিকে ডাল মেলে সেদিকেই উড়ে যান। বনের পাখিরে কে চিনে রাখে?

পাপিয়া রাহুলকে ভুলে যেতে চান। কিন্তু ভুলতে বসলে কেমন যেন মনে হয় যে, অনেক দিনের একটি পোষা পাখি বুকের পিঞ্জর ভেঙে সুদূর বনে উড়ে গেল! এতদিনের সোহাগ, স্বপ্ন, মায়া-মমতা সব যেন নিষ্ফল হয়ে গেল! ফুল-ভরা হৃদয় ঘেরা প্রেমের বাগান তেমনি পড়ে রইল, বসন্ত ফুলের হাসি মেখে দোলায়িত রইল, কুসুম-সৌখিণ দখিণ হাওয়া, পুষ্পগন্ধ, পাখি বিদায় নিল। কাননবালা যেন তাঁকে উপহাস করতে লাগল তাঁর নিষ্ক্রিয় যোগিনীবেশ ধারণ করার আগ্রহ দেখে, তাও জীবনের প্রথম নির্বাচনে।

পাপিয়া ঐদিন বিকেল বেলা আগ্নেয়গিরির পাশে একজন সুস্থ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে যেরকম দুঃসহ অস্বস্তি অনুভূত হয় সেই রকম অনল-যন্ত্রণা আপন বুকে উপলব্ধি করতে লাগলেন। অভ্যাসগতভাবে এ বাসাতেও ঐ সময় বারান্দায় আসা-যাওয়া করতে লাগলেন, কিন্তু অন্তরতরকে দূরে ফেলে যাওয়ার বিরহে লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার অশ্রু মুছলেন সঙ্গোপনে।

একবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবলেন, রাহুলকে ঠিকানা দিয়ে এলে হয়তো তিনি মাঝে মাঝে এদিকে আসতেন–না হয় বিমুখ হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ, আর তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে হৃদয়ের সাধ চোখের দৃষ্টিতে ঢেলে নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকতেন। তিনি এও ভাবলেন যে প্রথম দৃষ্টিপাতে রাহুল তাঁকে অন্তরে স্থান দিয়েছেন কিন্তু তিনি তো অসহায়, তাঁর দোষ নেই। যেহেতু তিনি হাতশূন্য, তাই তাঁর বুকশূন্য।

তাঁর বুক তো পাপিয়া ভরিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু বিধি তো তা চাইল না। এত কিছু ভেবে ভেবে তিনি বেসামালের মত হলেন। বড় বোন রাতে ভাত খাওয়ার সময় দেখলেন, পাপিয়া খুব ধ্যানমগ্ন, থালায় ভাত নেওয়ার আগে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে ময়লা পানি ঢেলে না ফেলে ভাবালুতার ঘোরে ঐ পানিতে ভাত তুলে নিলেন গামলা থেকে! আপা হেসে উঠলে পাপিয়ার ঘোর ভাঙল। লজ্জা পেলেন। আপা অতিরিক্ত লজ্জা দেবার জন্য অধিক কিছু বললেন না!

আপা বুঝতে পারলেন, পাপিয়া গোপন ও রহস্যময় কিছু অন্তরে পাথর চাপা দিয়ে চলছেন! তিনিও তো নারী। তাঁর বুঝার বাকি রইল না যে এ চিন্তা তাঁর বয়সের প্রয়োজনের তাগিদে। এ চিন্তাই তো জীবনকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। জীবনকে করে মধুময়, রসায়িত ও বাস্তবধর্মী। এটাও একটি তপস্যা, যা নারীকে তৈরি হতে শিক্ষা দেয় পুরুষ-সিংহকে পোষ মানিয়ে বুক জুড়ে আপন করে নিতে। এটা নারীর পূর্ব প্রস্তুতি। এ চিন্তাস্রোত বন্ধ হয়ে গেলে জীবনীর শক্তিতে আঘাত অনুভূত হয়। তাতে আত্মা কেঁদে ওঠে। জীবন নীরস লাগে। এক্ষেত্রে গুরুজনের শাসন অবাঞ্ছনীয়। কারণ, মুকুলকে ফুটতে না দিলে ভবিষ্যতের বংশ-বিস্তারকারী পুরুষ বা বীজ পাওয়া যাবে কি করে! তাছাড়া পাপিয়া জীবনের এই সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি এখন পুষ্পের ভূমিকায় প্রস্তুত।

পাপিয়ার এই পাথরচাপা দেয়া বিরহ চিন্তাস্রোতের সৃষ্টি করল। তিনি নিজেই যেন নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগলেন। এই প্রথম যেন তিনি দখিণা হাওয়া লেগে দল মেলে দুলে দুলে উঠলেন এবং যৌবন মাধুরীর গন্ধ তাঁর পরিবেশময় ছড়িয়ে পড়ল! তারই আকর্ষণে প্রেমিক ভ্রমর ধরা দিলেন কিন্তু নিজের লজ্জাবোধ ভ্রমরকে প্রেমকুঞ্জে প্রবেশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলল। তিনি যেন পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভ্রমরের চঞ্চলতাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। বুকের মধুতে জোয়ার এসে উথলে উঠল, দুলে উঠল প্রাণের পুলিন!

পাপিয়া গান শুনতে পছন্দ করেন, আর পছন্দ করেন দুঃখের মধ্য দিয়ে ঘটে যাওয়া মিলনাত্মক উপন্যাস। যে চঞ্চলতা, বাসন্তী স্পর্শের নাড়া, পুরুষ ভ্রমরের চুমুক চম্পন আজ তাঁর মন-প্রাণ রসায়িত করে তুলল তাতে ঘুম হবার কথা নয়, শুধু কোমল বিছানায় শুয়ে যৌবন বাগানের মধুর স্বপ্ন দেখাতেই আনন্দ বেশি! আজ তিনি ইচ্ছে করেই দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এমন সময় পাশের বাসার রেডিও থেকে একটি গানের সুর

ভেসে আসতে লাগল। তিনি গানটি শোনার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গানটির সুর পরিবেশকে প্রকম্পিত করে ধ্বনি হচ্ছে–

কানন যখন শূন্য মালা চেয়ে দু'হাত বাড়ালে।
হারিয়ে যাবার ছলনা করে শাখার ফুল ঝরালে॥
দুলত কুসুম হাওয়ার তালে
ফুটত কথা বাঁশির ডালে,
ফুল ঝরায়ে গজল-গাওয়া অচিন লোকে হারালে॥
শাখায় যখন কুসুম ছিল শুনিয়েছিল গীতি,
ঝরল ফুল, বাজিয়ে বাঁশি ফোটাও করুণ স্মৃতি!
কুসুম চেয়ে নয় যে কবি
চেয়েছিলে ফুল-সুরভি,
খোঁপার ফুলের গন্ধ নিতে বাতাস মুখে দাঁড়ালে॥

গানটির ভাব-ভাষা যেন পাপিয়ার স্বপ্ন-জগতের প্রণয় আবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ! তিনি মুগ্ধ মনে গানটি শুনছেন, চোখ দু'টি নীল আকাশে সংস্থাপিত। তরুণ চাঁদ যেন সন্ধ্যাতারা হারিয়ে যাওয়ার বিষাদ-বেদনায় বিরহ-মলিন! তাহলে তিনিও হারিয়ে যাওয়াতে রাহুল নিশ্চয় বেদনাতুর হয়ে হয়তো রাস্তায় পায়চারী করছেন।

দুই

ইরাক ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আস্ফালনের সঙ্গে সগর্বে ঘোষণা করলেন, "ইট উইল টেক্ অন্লি টেন মিনিট্স ফর এ্যামেরিকা টু পেরিশ ইরাক।" শুধু ঢাকা শহরে কেন, মনে হয় পৃথিবীর প্রতিটি বিবেকবান মানুষ তখন দূর দর্শন ও দূর শ্রবণ যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে বা বসে, ভিড় জমিয়ে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের ছবি দেখছেন ও শিহরণ-জাগা, কাঁপন-লাগা খবর শুনছেন।

উত্তপ্ত খবরের জন্য সংবাদপত্রগুলির শুধু চাহিদাই বাড়েনি, মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিন টাকার ইনকিলাব বা ইত্তেফাকের দাম এখন পাঁচ টাকা মাত্র। খবর শোনার জন্য মানুষের এত মনোযোগ যে, যেখানে কোন দোকানদারের রেডিও ঘিরে বিশ-ত্রিশজন উৎসুক শ্রোতা ভিড় জমিয়েছেন সেখানে একটি সূচ ফেলে দিলে যে ক্ষীণ শব্দ হবে তাও প্রতিটি মানুষের কানে যুদ্ধের বোমার মত আওয়াজ করে উঠবে বৈকি। এত নীরব মনোযোগ, হৃদ্যতা ও প্রবিষ্টতা খবর শ্রবণের প্রতি।

এখন রেডিও ও টেলিভিশনের খবর প্রচারের কোন নির্দিষ্ট সময়সূচী কার্যকারণের নিয়ম-নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলে মনে হয়। সংবাদ সংস্থাগুলি যখনি কোন ইম্পোর্টেন্ট্ খবর পাচ্ছে তখনি তা বিশেষ ঘোষণার বরাদ দিয়ে সম্প্রচার করছে।

ফকিরাপুলের গরম পানির গলি দিয়ে সন্ধ্যাবেলা টিউশনীর ছাত্র পড়াতে যাচ্ছেন রাহুল। বেকার জীবনের মরিচা ধরা চাকার গতি-পথ নির্ণয় করছেন টিউশনী করে। কোনমতে এক টাকা দামের দুই-তিনটি করে শিঙ্গারা খেয়ে রাত কাটান, তার সাথে দুই-তিন গ্লাস ঠাণ্ডা পানি জামিন দিয়ে। বর্তমানে সরকারি চাকুরি পাওয়া তো শেরপা টেনর্জি নর্কের মত করে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার মত দুঃসাধ্য যোগ্যতার কাজ। একটি পোস্টে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলে দশ লক্ষ শিক্ষিত

বেকার যুবক-যুবতী আবেদন করে বসে। অষ্টম শ্রেণি পাস লোক হোম-গার্ডের জন্য চেয়ে বসলে বি. এ. পাস ডিগ্রিধারীরা সবিনয়ে আবেদন করে বসেন। তাতেও আবার ঘুষ বা সিকিউরিটি মানি প্রদান করতে হয়। হায় রে জাতির দুরবস্থা! সরকারি দূরে থাকুক, বে-সরকারি বা মালিকানাধীন কোন ফার্মে বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেতে গেলেও কমপক্ষে তিনটি যোগ্যতা থাকতে হয়–নিয়োগপ্রাপ্তব্য কর্মে অভিজ্ঞতা, ঘুষ দেবার সামর্থ এবং কর্তৃপক্ষের সান্নিধ্য লাভের হট লাইন। কিন্তু এই তিনটি যোগ্যতার একটিও রাহুলের নেই। তিনি দুই বছর মৌলভী সাহির আলী হাইস্কুলে ঈর্ষা সৃষ্টিকারি জনপ্রিয়তা, যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু বেগিং নেই বলে তাঁর চাকুরিটা টিকল না। তাছাড়া শিক্ষকতায় এত কষ্ট অথচ দারিদ্র্য মোচনের উপায় না দেখে তিনি ঢাকা শহরে চলে আসেন কোন বেটার চাঞ্চের আশায়। অন্যদিকে তিনি সিলেটের লোকদের অনেকটা জঙ্গলী স্বভাবের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। এখন দুই হাজার টাকার টিউশনী করে আরামবাগের এক ম্যাছে থাকছেন। যদিও জীবন যৌবন এখন সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গের মত, দারিদ্যের কশাঘাতে এবং জীবনের অনিশ্চয়তার কুটিল চিন্তায় মানসিকতা সম্পূর্ণ নিরামিষ।

শীতের লবণু-মিশানো আমেজ ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিছু ভদ্রলোককে হালকা-পাতলা সোয়েটার ও চাদর গায়ে জড়াতে দেখা যাচ্ছে। রাহুল গরম পানির গলি দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন। একটি বাসায় তিনি হাইস্কুলের দু'টি ছেলে-মেয়েকে অংক কষান ও ইংরেজি পড়ান। সন্ধ্যা উতরিয়ে আবছা আঁধার যেন মৃদু হাওয়ায় ঠাণ্ডার পশরা নিয়ে পথিকের গায়ে পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। দিবস তার কর্ম-ব্যস্ততা ধীরে ধীরে রজনীর কোমল কোলে সমর্পণ করার নিত্য পালিত প্রস্তুতির মহড়া দিচ্ছে। রাহুল একটি মুদির দোকানের কাছে এসে দেখলেন পথ যেন সম্পূর্ণ আটকানো, সংবাদ-শ্রোতার দুর্ভেদ্য ভিড়, তাঁরা খুব মনোযোগের সঙ্গে খবর শুনছেন রেডিওতে। মুদির দোকানদার রেডিও অন করে খবর শুনতে নেওয়ায় পথের লোকজন শ্রোতাস্বরূপ এ অরণ্য ভিড় জমিয়েছেন। সংবাদের মাঝে মাঝে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ইংরেজিতে পরিবেশন করা ভাষণের গর্বিত বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, "ইট উইল টেক্ অন্‌লি টেন মিনিট্‌স্ ফর এ্যামেরিকা টু পেরিশ ইরাক।" মনে হয় এই উদ্ধৃতির অর্থ বুঝতে না পারায় কিছু শ্রোতা ও দোকানদার আঁতকে উঠছেন এবং একে অপরের মুখের দিকে বিবর্ণ বদনে তাকাচ্ছেন।

খবর শেষ হয়ে গেলে পথিক-শ্রোতারা আপন গতিতে যাঁর যাঁর পথে চলছেন। শুধু সেখানে অব্যক্ত কোন আবেগে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন রাহুল। তাঁর চোখ দু'টি আজকের ইত্তেফাকের উপর সংস্থাপিত। দোকানদারের বুঝতে কষ্ট হল না যে, এই তরুণ ভদ্রলোক সংবাদ পত্রটি পড়তে চাচ্ছেন।

দোকানদার বললেন, "এটা পড়তে চান? আজকের ইত্তেফাক বসুন ঐ সুপারির পটটি সরিয়ে রেখে।"

দোকানদারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। লোকটি মনে হল বেশ হাসিখুশি ও জিজ্ঞাসু। তাকিয়ে রইলেন অজ্ঞাত তরুণ বন্ধু কি পড়েন। কিন্তু রাহুল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনামগুলি পড়ে ভিতরের কলামে কি-সব যেন ব্যস্ততার সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। অর্থাৎ তিনি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলি অনুসন্ধান করতে নিলেন, তা দোকানদারের বোঝার বাকি রইল না। পকেট থেকে টুকরো কাগজ বের করে একটি বিজ্ঞপ্তি উঠিয়ে

নিলেন। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হলে দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বুঝি চাকুরি পাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি খোঁজাখুঁজি করছেন?"

রাহুল বললেন, "জী। চাকুরি খুঁজছি। আমি বড় অসহায়, বেকার অবস্থায় আছি। সরকারি, বে-সরকারি বা প্রাইভেট ফার্মে– যে কোথাও হোক না কেন আমার একটি চাকুরীর একান্ত দরকার।"

দোকানদার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "চাকুরি কে দেবে রে ভাই? কোথায় পাবেন চাকুরি? তা আপনি কতদূর পড়া-শুনা করেছেন?"

রাহুল বললেন, "আমি বি. এ. পাস করেছি। বি. এড. ডিগ্রিও আছে।"

"কোন আত্মীয়-স্বজন নেই যাঁরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন?"

রাহুল বললেন, "এখানে ঢাকা শহরে নেই। আর থাকলে বা কি! আমি কি ঘুষ দিতে পারব যে আমার চাকুরি হবে?"

"হ্যাঁ, তাই বলুন। আপনি প্রতি সন্ধ্যায় এ পথে পূর্বদিকে কোথায় যান?"

রাহুল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন "ঐ যে তিন-তলা দালানটা দেখছেন, তার দ্বিতীয় তলায় কুমিল্লার এক ভদ্রলোক বাস করেন। তাঁর দু'টি ছেলে-মেয়েকে পড়াই।"

"আপনি কোথায় থাকেন? মাসিক ইনকাম কত?" রাহুল বললেন, "আরামবাগে এক ম্যাছে থাকি। মাসিক আয় দু'হাজার টাকা, টিউশনী করে যা পাই।"

"তা দিয়ে খরচ চলে?"

"কোনমতে চলতে হয়। সীট-ভাড়া, খাওয়া ও বুয়ার বেতন দিয়ে সঞ্চয় থাকে না, কষ্ট হয়।"

দোকানদার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনি তো শিক্ষিত লোক। ইংরেজী মনে হয় ভাল বোঝেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি বললেন ইংরেজীতে– যে কথাটি বার বার বলা হচ্ছে। আপনার মনে পড়ে?"

রাহুল বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়ে। ইট উইল টেক্ অনলি টেন মিনিটস্ ফর এ্যামেরিকা টু পেরিশ ইরাক।"

"এর অর্থ কি?"

"এর অর্থ, আমেরিকার মাত্র দশ মিনিট লাগবে ইরাককে ধ্বংস করতে।"

"ভাই দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলছেন কেন? বসুন।"

"না, বসব না। আরও এক জায়গায় পড়াতে হবে। পরে অন্য সময় কথা বলব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। এদিক দিয়ে আসতে যেতে সময় পেলে আমার দোকানে বসবেন। ও আপনার নামটা কি?"

"আমার নাম? শামসুল হুদা রাহুল।"

"আচ্ছা, বড় ভাই, আপনার নাম?"

"আমার নাম গোলাম রব্বানী।"

রাহুল বললেন, "ভাই, এখন আসি।"

তিন

ফকিরাপুল নাজমা ফটোস্ট্যাট সেন্টারের দিকে খুব দ্রুত ছুটছেন রাহুল। তিনি ডিগ্রির সকল সনদপত্রের প্রতিলিপি করাবেন। আরামবাগ গার্ল্স হাইস্কুলে বাংলায় একজন ও ইংরেজীতে একজন শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। দরখাস্তের সাথে মূল

সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজন করতে হবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময়সীমা মাত্র তিন দিন বাকি। তাই এত তাড়াহুড়া। তবে শুধু সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি করে নিলেই তাঁর ডাকযোগে দরখাস্ত প্রেরণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়।

ফটোস্ট্যাট সেন্টারের দুয়ারে বিছানো পাপসে জুতার তলা মুছে এবং চলার গতি কিছুটা কমিয়ে রাহুল ভিতরে প্রবেশ করলেন। রিচিপ্সনিস্ট্ উৎসুক দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই সাহেব?"

"আমি সনদপত্রের অনুলিপি করাবো।"

"তাহলে ভিতর কক্ষে যান।"

ভিতরে আর একটি সজ্জিত কক্ষ আছে। সেখানে ফটোস্ট্যাট মেশিন বসানো। কিন্তু চিকন দরজাটির দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা প্রিন্ট কাপড়ের পর্দা টাঙানো। সবেগে ঢুকতে রাহুল সোয়ান ফোমের মত নরম কিসের উপর যেন তাঁর ডান হাত পড়ল বলে অনুভব করলেন। বাম হাতে সনদপত্রের ফাইল। দুই দিকের ধাক্কা যখন পূর্ণ শক্তিতে চাপ সৃষ্টি করল তখন রাহুল বুঝতে পারলেন যে তিনি এক তরুণীর শরীরে হোঁচট খেয়েছেন। তরুণী ধাক্কা খেয়ে, পিছিয়ে যেতে পিছনের একটি টুলের উপর ভাঁজ হয়ে বসে পড়লেন। রাহুলের বাম হাতের ফাইলটা ছিটকে পড়ে গেল তরুণীর সম্মুখে, একেবারে পায়ের কাছে যেখানে তাঁর ফাইলটা আগেই পড়ে গিয়েছিল। ফাইল দু'টি যেন তাকের উপরে রাখার মত পূর্ণ সজ্জিত।

ফটোস্ট্যাট কারিকর বিপরীত মুখে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। তিনি খুব ব্যস্ত। পাশে আরও দুজন লোক দাঁড়িয়ে। পর্যায়ক্রমে তাঁদের নিজ নিজ কাজ সমাধার প্রতি তাঁরা নিমগ্ন। তাঁরাও বিপরীত-মুখী। আর কোন কঠিন পদার্থের সাথে তো ধাক্কা লাগেনি যে গ্রিলের দরজা বা হাঁড়ি-পাতিলের মত স্বশব্দে আওয়াজ হবে। রাহুল লজ্জায় অপ্রতিভ। তরুণী ম্লান বদনে নিষ্প্রভ ও সঙ্কুচিত। কিন্তু চন্দ্রবিহীন ভোর আকাশের উজ্জ্বল ঝিকিমিকি আলোকময় শুকতারার মত চোখ দু'টি যেন রাহুলের মুখের উপর স্বেচ্ছায় সংস্থাপিত হয়ে ছলছল দৃষ্টিতে জ্বলছে। তরুণী নির্বাক। অতক্ষণে পুষ্পিত বুকের শাপলা আঁচল যেন সমর-শক্তিতে সামলিয়ে নিয়েছেন। আবেগ, অবচেতন ও দমিত মানসিকতার প্রভাবে রাহুল যেন মুহূর্তের মধ্যে তন্ময়তাময় বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেলেন। কিছুটা আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেলে দোষ স্বীকার করে সবিনয়ে বললেন, "আই'ম সরী, ম্যাডাম্।" তিনি স্বহস্তে ফাইল দু'টি উঠিয়ে নিয়ে নিজেরটা হাতে রেখে সুশীলা তরুণীরটি তাঁকে দিলেন।

কিন্তু তরুণীর মুখমণ্ডলে না ঘৃণার ছাপ, না বিরক্তির বর্ণ-রঞ্জন, না কটাক্ষপাতের বাণ-বেঁধা দৃষ্টি। রাহলের উপরে দোষ চাপানোর কোন রকম ব্যগ্রতা বা অভিযোগ হানার আকার-ইঙ্গিতটুকু দেখা গেল না, বরং কত কালের যেন কি একটা সচকিত, দুর্দমনীয় ও বক্ষ-পেষণ ধর্মী মায়া-বিম্বন তাঁর চোখে-মুখে সোনার হারের আলোক দ্যুতির মত ঝলকে উঠল। লজ্জিত ভঙ্গীমাতে নীরবে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। চলার গতিতে বুঝা গেল তিনিও কোন জরুরি কাজে ভীষণ ব্যস্ত।

রাহুল সনদপত্রের ফটোস্ট্যাট কপিগুলি ফাইলে গুছিয়ে নিয়ে চপল পায়ে হেঁটে ছুটলেন সেগুনবাগিচায় অবস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসের দিকে– সেখানে সেগুলি সত্যায়িত করে নেবেন। অফিস-কক্ষের টাঙানো পর্দাটি আলগিয়ে ভিতরে ঢোকার জন্য ডান পা ফেলতেই দেখেন এক জোড়া নীল চোখ সন্ধ্যাতারার মত তাঁর সর্বাঙ্গে আলোকপ্রভা ছড়িয়ে তাকাচ্ছে মাত্র। মনে হল যেন এই সেই দু'টি চোখ–তরুণী প্রেমিকা

বিয়েট্রিসের চোখ, যাদের বিদ্যুৎ বর্ষিত আলোকছটায় মহাকবি ডান্টের লেখা ডিভাইন কমেডীর শব্দ-সুর, ছন্দ-গন্ধ, স্বাদ-অবসাদ ঝর্ণার অবারিত লালিত্যময় ঝঙ্কারের তালে নিগঢ়ে পড়ছে। ব্যস্ত পথিকের সামনে কোন চলন্ত সাইকেল বা ট্যাম্পু সশব্দে আচম্বিত দাঁড়ালে পথিক যেমন বাধাগ্রস্ত হয় রাহুল তেমনি করে হতচকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কি আর করা! সুধীর পদে প্রকৌশলীর টেবিলের দিকে অগ্রসর হলেন। সালাম দিলেন রাহুল।

সত্য বলতে কি, তরুণী তাঁকে দেখে প্রথমে সন্দেহে হতচকিত ও শীলতা রক্ষার দাবীতে শঙ্কিল হয়ে উঠলেও রাহুলের এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পূর্ব ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। তবে রাহুলের সেদিকে মনোযোগ ছিল কি না জানি না, টেবিলের নিকটবর্তী হলে শুনতে পেলেন অনুচ্চস্বরে সালামের জবাব এল তরুণীর কণ্ঠ থেকে। কণ্ঠের ছন্দ, তাল, লয় সব কিছুই স্বাভাবিক, মার্জিত এবং গ্রহণযোগ্য, তা স্পষ্ট বুঝা গেল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আগেই সালাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাহুল যখন জি. পি. ও-তে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তরুণীর পত্র-প্রেরণ সম্পর্কিত কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। রেজিস্ট্রি পোস্টাল কাউন্টারে ভিড় নেই। মাত্র একজন। পোস্ট-মাষ্টার সাহেব বললেন, "আপনি আট টাকা দিন ডাক-মাশুল।"

রাহুল পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বের করে দিয়ে বললেন, "এই নিন্।"

এদিকে তরুণী অহেতুক অজুহাতে পায়চারী করছেন। যাতে কিছুটা দেরি হয় আর ইতোমধ্যে রাহুলের ডাক-প্রেরণের কাজটিও চুকিয়ে যায়। তাই হল। মুখ ফিরাতে রাহুল দেখেন, ভাবাবেগে প্রবল ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে কৌণিক অবস্থানে স্বচ্ছ দু'টি চোখে তরুণী তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে কিছু বলতে চান, শুধু প্রসঙ্গ তৈরির বাকি। রাহুল স্বগোতুক্তিতে নিম্ন স্বরে বলে বের হতে লাগলেন, "বাসায় গিয়ে আগে ডান হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।"

কথাটি তরুণীর কানে গিয়ে সুস্পষ্ট শব্দে পৌঁছল। মুখ ফিরিয়ে রঞ্জিত ঠোঁট কামড়িয়ে দ্রুত চুপিসারে হাসলেন। পিছন থেকে বিনীত কণ্ঠে ডেকে বললেন, "এই যে, শুনুন তো। আপনি কেমন আছেন?"

রাহুল মৃদু হেসে বললেন, "কেন, জানার প্রয়োজন কি খুব বেশি?"

"না তা নয়, মানে এমনিতে জানতে চাচ্ছি। বুঝি জরুরি কোন চিঠি-পত্র পাঠালেন?"

"জী হ্যাঁ। চাকুরীর জন্য একখানা দরখাস্ত পাঠালাম।"

তরুণী বললেন, "ও আপনি বুঝি বেকার? তা ডিগ্রি কি, মানে কতদূর পড়া-শুনা করেছেন, তাই জানতে চাচ্ছি।"

রাহুল তাঁর নাম, ডিগ্রি, এখন কি করেন সব কিছু মুক্ত কণ্ঠে খুলে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বুঝি ভদ্রলোকের কাছে পত্র পাঠালেন?"

বেচারি মুখ খুলে হাসলেন। বললেন, "ভদ্রলোকের কাছে চিঠি পাঠাতে বুঝি সত্যায়িত করতে হয়? তা ভদ্রলোক কাকে বলছেন?"

"না, মানে আপনার স্বামী।"

"না, আমার এখনো বিয়ে হয়নি। আমিও একখানা দরখাস্ত পাঠালাম একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষয়িত্রীর পদে আবেদন করে। আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমি? আরামবাগের এক ম্যাছে।"

"চলছেন কিভাবে?"